সুলতান মাহমুদ গজনভী

মূর্তি চূর্ণকারী ও বিদআতের দমনকারী

মূর্তি ভাঙ্গা এবং জালানো তাগুত কে বর্জনের অন্যতম প্রধান রূপ যার ওপর সকল নবীগণ আমল করেছেন। বিশেষ করে ইব্রাহীম ﷺ কর্তৃক কুঠার দিয়ে তার কওমের মূর্তি ভাঙ্গন, মুসা ﷺ কর্তৃক বনি ইসরাঈলের উপাসনাকৃত স্বর্ণ নির্মিত বাছুর বিগলন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। একইভাবে, আল লাত, মানাত, উযযা, হোবল এবং অন্যান্য মূর্তি জালানো ও ধ্বংসের মাধ্যমে শেষ নবী রাসুল ﷺ মক্কার তৎকালীন আরবদের মূর্তি প্রথার অবসান ঘটিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সাহাবাগণ, তাবেঈগণও একই পথে হেঁটেছেন এবং বর্তমান প্রজন্মের যারা হেদায়েতের অনুগামী তারা সবাই একই ধারার অনুসরণ করেন।

মুসলিম উম্মাহর পরবর্তী ইতিহাসে এমন ব্যক্তির নজির পাওয়া যায়, যারা নবী ﷺ এর অনুসরণে পৌত্তলিকদের মূর্তি ধ্বংস করাকে তাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। এই লক্ষ্য অর্জনে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন, এমনকি কঠিন মরু প্রান্তর পার হয়ে, অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সেই লক্ষ্য অর্জনে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। এদের মাঝে অন্যতম হলেন বীর যোদ্ধা মাহমুদ ইবন সুবুক্তিকিন ﷺ, যার ডাক নাম "মূর্তি চূর্ণকারী", কারণ তিনি অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন। এটা হল তার চরিত্রের বহু মহৎগুণের একটি মাত্র, তার অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে সুন্নাহর সমর্থন, বিদআত নির্মূল করা এবং আব্বাসী খলিফার প্রতি বাইয়াহ ও আনুগত্যের মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

সুলতান মাহমুদ ইবন সুবুক্তিকিন ﷺ ৩৬০ হিজরি সনের মুহাররাম মাসে খোরাসানের গজনাহ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার মৃত্যুর পর ৩৮৭ হিজরি সনে তিনি শাসকের পদ লাভ করেন। এরপর মূর্তি ধ্বংস এবং ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে ভারতের মুশরিকদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন। সুলতান মাহমুদ ইবন সুবুক্তিকিন ﷺ ৩৯৬ হিজরি সনে কাওয়াকির দুর্গে হামলা করেন, যেখানে ৬০০ পৌত্তলিক মূর্তি রক্ষিত ছিল। সেই দুর্গ জয়ের পরে তিনি সেখানকার সব মূর্তি জালিয়ে দেন। (ইবনুল আছির: আল- কামিল)

৩৯৮ হিজরি সনে সুলতান মাহমুদ গজনবী ভারত আক্রমণের জন্য পুনরায় ফিরে আসেন। ইবনুল আছির বলেনঃ "তিনি সিন্ধু নদীর তীরে এসে উপনীত হন। সেখানে ভারতীয় সৈন্যসহ রাজা আনন্দপালের সাথে তার মোকাবিলা হয়। সারাদিন যুদ্ধ হয়, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল মুসলিমগণ পরাজিত হবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করেন। ফলে মুসলিমগণ ভারতীয়দের পরাজিত করে। তাদের কতক পলায়ন করে আর কতক তরবারির আঘাতে নিহত হয়। "ইয়ামিন আদ দাওলাহ" (সুলতান মাহমুদ গজনভী) আনন্দপাল কে ধাওয়া করে উঁচু পর্বতে অবস্থিত বাহিম নগর দুর্গে নিয়ে যান। দুর্গটি ছিল ভারতীয়দের নিকট অন্যতম বিশাল একটি মূর্তির ধনাগার। যখন ভারতীয়গণ তার শক্তিমত্তা, যুদ্ধের অদম্য ইচ্ছা এবং তাদের দিকে তাকে ক্রমাগত ধাবমান হতে দেখল, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করত দুর্গের প্রবেশ দ্বার খুলে দেয়। মুসলিমগণ দুর্গের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং নিকটস্থ সহচর ও বিশ্বস্ত সঙ্গীদের নিয়ে ইয়ামিন আদ দাওলাহ দুর্গে আরোহণ করেন। তিনি অসংখ্য জহরত এবং নয়শ মিলিয়ন শাহী দিনার অর্জন করেন"। (আল কামিল) এভাবে আল্লাহ মুশরিকদের এবং তাদের তাগুতদের অপদস্থ করেন। মূর্তিসমূহ ধ্বংস করা হয় এবং দামী মনি মুক্তা, হীরা জহরত যা কিছু বৃহত্তম মূর্তিকে অর্ঘ্য প্রদান করা হয়েছিল মুসলিমগণ তা গানিমাহ হিসেবে লাভ করে।

৪০০ হিজরি সনেও সুলতান একই ভূমিকা পালন করেন, ভারত আক্রমণ করে প্রচুর সম্পদ লাভ করেন ও মূর্তি সমূহ নির্মূল করেন। ৪০৫ হিজরি সনে তিনি থানেসারে অভিযান চালান। ইবনুল আছির বলেন, "যখন লক্ষের কাছাকাছি চলে আসেন, তারা এক খরস্রোতা নদীর সন্ধান পান যা পার হওয়া ছিল দুরূহ, উপরন্তু অত্র এলাকার শাসক তার বাহিনী ও যুদ্ধের হাতী বহর নিয়ে পারাপারে বাধা প্রদানের জন্য নদীর ওপারে তখন অপেক্ষা করছিল। ইয়ামিন আদ দাওলাহ তার সাহসী যোদ্ধাদের আদেশ করেন, নদী পার হয়ে কুফফারদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য, যাতে বাকি যোদ্ধাগণ এই সুযোগে পার হতে পারে। আদেশ অনুযায়ী তারা ভারতীয়দের যুদ্ধে ব্যস্ত রাখে, যতক্ষণ না বাহিনীর বাকি সদস্যগণ তৎকালীন প্রবল স্রোতা নদী পার হয়ে দিনের অবশিষ্ট সময় সকল ফ্রন্টে যুদ্ধাভিযান চালিয়ে যায়। ভারতীয়রা পরাজিত হয় আর মুসলিমগণ জয়ী হয়। শত্রু কর্তৃক আনিত ধন-সম্পদ ও হাতীর বহর তারা গানিমাহ হিসেবে লাভ করেন।"

কতিপয় ইতিহাসবিদ এই মর্মে উল্লেখ করেন যে, জনৈক ভারতীয় রাজা যুদ্ধ না করার শর্তে সুলতান কে প্রস্তাব করে যে, "আমি জানি, এটা এমন কাজ যার দরুন আপনি আপনার রবের নৈকট্য লাভ করেন। তবে এ পর্যন্ত অসংখ্য মূর্তি আর মন্দির, বিশেষ করে নাকারকাট দুর্গের মূর্তি আর মন্দির ধ্বংস করে আপনি কি অঢেল সম্পদ অর্জন করেন নি?" পরে তাকে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় কিন্তু সুলতান তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এই ঘোষণা করেন যে, তিনি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য এবং তার সন্তুষ্টির রাহে লড়াই করেন, দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিলের জন্য নয়। এরপর দ্রুত তিনি মন্দিরে হামলা করে তাদের সকল মূর্তি ধ্বংস করেন, কেবল একটি ব্যতীত, যা তিনি পায়ের নিচে মাড়ানোর জন্য সঙ্গে করে নিজ দেশে নিয়ে আসেন ।

৪০৭ হিজরি সনে সুলতান মাহমুদ অন্যতম সুরক্ষিত একটি দুর্গে অভিযান পরিচালনা করেন। ইবনুল আছির বলেন, "তারা এ দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক মূর্তি রাখে যার মাঝে পাঁচটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত, দামীয় মনি পাথর খচিত। তাতে স্বর্ণের মূল্যমান ছিল মোট ৬৯০৩০০ দিনার। সেখানে পাথরে খোদাই করা আরও দুইশ মূর্তি ছিল। ইয়ামিন আদ দাওলাহ যাবতীয় সম্পদ গানিমাহ লাভ করেন আর বাকি সব কিছু ধ্বংস করেন। এরপর তিনি কান্নাউয অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানকার দুর্গ ও নদীর তীরবর্তী সাতটি শহর দখল করেন। সেখানে আনুমানিক ১০,০০০ মূর্তির ঘর ছিল এবং সেগুলো ২০০০০০ থেকে ৩০০০০০ বছরের পুরানো বলে মিথ্যা দাবি করা হত। যখন তিনি সেখানে পৌঁছান তার সৈন্যগণ সেগুলো গুড়িয়ে দেয়"।

কিন্তু সুলতানের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়- মূর্তি ধ্বংসের ক্ষেত্রে- যার প্রভাব ছিল ব্যাপক, ৪১৬ হিজরি সনে সংঘটিত হয়, যখন তিনি সোমনাথ নামক পৌত্তলিক ভারতীয়দের প্রধান মূর্তি ধ্বংস করেন। ইবনুল আছির তা এভাবে বর্ণনা করেন, "এই মূর্তি ছিল ভারতীয়দের নিকট সবচেয়ে বড় মূর্তি, প্রত্যেক অমাবস্যার রাতে তারা সেখানে তীর্থ যাত্রায় যেত। প্রায় ১০০০০০ লোক সমাগম হত… তারা তাদের কাছে মূল্যবান যা কিছু ছিল নিয়ে যেত এবং পুরোহিতদের বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করত। সেখানে প্রদান করা সম্পত্তি ১০০০০ গ্রামে বণ্টন করা হয়েছিল"।

এত অঢেল ধন সম্পদ সত্ত্বেও এই নির্মূল অভিযানের পেছনে সুলতানের কোন পার্থিব অর্জনের তাড়না ছিল না। বরং তিনি ভারতীয়দের নিকট বিবেচিত প্রধান মূর্তি ধ্বংসের মাধ্যমে মূর্তি পূজার সমাপ্তি টানতে চেয়েছিলেন। ইবনুল আছির বলেন, "যতবার ইয়ামিন আদ দাওলাহ জয়ী হন, ভারতীয়রা বলত যে সোমনাথ ঐ মূর্তিগুলির প্রতি বিরূপ ছিল। যদি সে সন্তুষ্ট থাকত, তবে যে কেউ তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করত, সে তাকে ধ্বংস করত। যখন এই খবর ইয়ামিন আদ দাওলাহ'র কাছে পৌঁছায়, তিনি এই সোমনাথকে আক্রমণ করে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেন, একথা চিন্তা করে যে, সোমনাথকে হারালে এবং তাদের মিথ্যা দাবির অসারতা প্রকাশ পেলে ভারতীয়গণ ইসলাম গ্রহণ করবে। ফলে ইস্তিখারা আদায় করে ৪১৬ হিজরি সনের ১০ই শাবান মাসে গজনাহ থেকে অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবী ছাড়াও ৩০০০০ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তিনি রওনা হন।

এই মূর্তির কাছে পৌঁছানোর রাস্তা ছিল বেশ কঠিন ও কষ্টসহিষ্ণু, যেহেতু মরু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পাড়ি দিয়ে যেতে হয়েছিল। তদুপরি এরূপ ঝুঁকি এই মূর্তি ধ্বংসের সংকল্প থেকে মুওয়াহিদ সুলতানকে টলাতে

পারে নি। ইবনুল আছির বলেন, "যখন তিনি মরু অতিক্রম করেন, তিনি এর প্রান্তরে দুর্গসমূহ দেখতে পান যেখানে সৈন্যরা সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত ছিল, আরও বেশ কিছু কুয়ার সন্ধান পান, যেগুলো তার হামলা থেকে রোধ কল্পে বালু দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল। তার অগ্রযাত্রার দরুন মুশরিকদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে আল্লাহ তার বিজয়কে সহজ করে দেন, ফলে তারা আত্ম সমর্পণ করে। তিনি অধিবাসীদের কতল করেন, মূর্তিসমূহ ধ্বংস করেন এবং তার প্রয়োজন মত পানি ও রসদ সংগ্রহ করেন"। এভাবে মরু পাড়ি দিয়ে, লোকদের সাথে যুদ্ধ করে এবং দুর্গসমূহ অবরোধ করে তিনি সোমনাথের কাছে পৌছান। ইবনুল আছির বলেন, "তিনি যুলকাদ্দ মাসের মাঝামাঝি বৃহস্পতিবার দিন সোমনাথের কাছে যান এবং সেখানে সমুদ্র প্রান্তরে প্রবলভাবে সুরক্ষিত দুর্গ দেখতে পান। সমুদ্রের স্রোত দুর্গের কিছু অংশে এসে পৌছাতো। লোকেরা দেয়ালে বসে মুসলিমদের দেখতো আর তাদের মূর্তির নিকট কামনা করত, যাতে মুসলিমদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় আর তারা ধ্বংস হয়"। পৌত্তলিকদের চিন্তা ভাবনা ছিল এরূপ অলীক ও অবাস্তব। তারা কিভাবে তাওহীদের সৈন্যদের মোকাবিলা করবে, যারা পৃথিবীকে শিরক ও মুশরিকদের কালিমা থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর রাহে জিহাদ করে?

ইবনুল আছির আমাদের নিকট যুদ্ধের বিশদ বিবরণ দেন এবং পৌত্তলিকদের শোচনীয় মানসিক অবস্থা তুলে ধরেন যখন তারা তাদের মূর্তির নিষ্ক্রিয়তা প্রত্যক্ষ করে, মুসলিমগণ ধ্বংস করতে আসা সত্ত্বেও যখন মূর্তিটি অনড় অবস্থায় পড়ে থাকে। তারা সমস্ত আশা ভরসা এই মূর্তির ওপর রেখেছিল। তাদের উপাসনার বস্তু পরস্পর লড়াই করে, এমন ভ্রান্ত ধারণার দরুন, তারা এরূপ দাবি করত যে, তাদের কোন মূর্তি এই মূর্তির ক্রোধ ছাড়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নি। ইবনুল আছির বলেন, "ভারতীয়রা মুসলিমদের আগে কখনো এভাবে যুদ্ধ করতে দেখে নি, ফলে তারা দেয়াল ত্যাগ করে যেতে লাগল, যেহেতু মুসলিমগণ মই লাগিয়ে দেয়ালে উঠে ইসলামের মহিমা প্রকাশ-পূর্বক তাকবীর ধ্বনি দিতে লাগল। যুদ্ধ তখন তীব্রতর হল, এমন প্রকট আকার ধারণ করল যে, এক দল ভারতীয় সোমনাথের কাছে গিয়ে তাদের গালে মাটি দিয়ে চাপড়িয়ে জয়ের জন্য আকুতি মিনতি জানাতে লাগল। রাতে যুদ্ধ বিরতি হল। পরের দিন মুসলিমগণ আগে অভিযানে বের হল, অনেক ভারতীয়দের কতল করে তাদেরকে শহরের বাইরে হটিয়ে তাদের মূর্তি সোমনাথের ঘরে আবদ্ধ করল। এর দ্বারে ভারতীয়রা ভীষণ যুদ্ধ করল। প্রত্যেক দল সোমনাথের কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল, অনুনয়ের সাথে প্রার্থনা করে পরে যুদ্ধে গিয়ে নিহত হত, যতক্ষণ না প্রায় সম্পূর্ণ রূপে তারা নিশ্চিহ্ন হল। অল্প যারা জীবিত ছিল তারা বাঁচার আশায় দুটো নৌকায় করে সাগরে পাড়ি জমায়। কিন্তু মুসলিমগণ তাদের পাকড়াও করে হত্যা করে আর কতক পানিতে ডুবে মরে"। সোমনাথের পরিণতি এই হয়েছিল যে, " ইয়ামিন আদ দাওলাহ সোমনাথকে ভেঙ্গে এর কিয়দংশ আগুনে পোড়ান আর বাকি অংশ সঙ্গে করে গাজনায় এনে মূল মসজিদের প্রবেশ পথে রাখেন"। এভাবে মূর্তিটিকে ধ্বংসের পর পায়ের নিচে মাড়িয়ে চরমভাবে লাঞ্ছিত করা হয়।

মুসলিমগণ এই যুদ্ধে এত গানিমাহ লাভ করে যে, জিহাদের পথে তাদের যে ব্যয় হয় তার ক্ষতি পূরণ আদায় হয়, এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য বিশেষ নেয়ামত। ইবনুল আছির বলেন, "এই ঘর সমূহে বিদ্যমান সম্পত্তির পরিমাণ ছিল বিশ মিলিয়ন দিনারের অধিক এবং তা সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়। যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজারের অধিক"।

সুলতান মাহমুদ গজনভী ৪২১ হিজরি সনে তার মৃত্যু অবধি জিহাদ অব্যাহত রাখেন। ভারতে বেশ কয়েকশ বছর যাবত ইসলাম কায়েম থাকায় তার জিহাদের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। সোমনাথ ধ্বংসের দরুন পৌত্তলিকদের ওপরেও তার অনেক প্রভাব ছিল। আল্লাহর রাহে লড়াই করার জন্য সুলতানের এই ধারাবাহিকতা কেবল মুশরিকদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তিনি বিভ্রান্ত মুবতাদিয়া আর মুরতাদ বাতিনিয়্যার ঘাড়ে তার তরবারি শক্ত হাতে তুলে ধরেন। বর্তমান জামানায় তার বিদআত দমন ও সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত থাকবে।

পর্ব-২

সুলতান মাহমুদ গজনভী মূর্তির সমূল উৎপাটনে আত্মনিয়োগ করেন, ভারতীয়দের বৃহত্তম মূর্তি সোমনাথ ধ্বংসসহ বেশ কিছু ঘটনা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। মুসলিম জামায়াতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং বিদআতিদের সাথে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তিনি তেমনই ধারাবাহিক ছিলেন, যেমন ধারাবাহিক ছিলেন তিনি শিরক এবং মুশরিক বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে। ইতিহাসে এরূপ বেশ কিছু ঘটনার নজির পাওয়া যায়।

৪০৪ হিজরি সনে এক অভিযান থেকে ফেরার পর তিনি আব্বাসী খলিফা আল কাদির বিল্লাহর কাছে তার এক দূত প্রেরণ করেন। তিনি এই আবেদন করেন যে, তাকে যেন বিজিত এলাকায় কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। ইবনুল আছির বলেন, "যখন তিনি অভিযান শেষ করে

গজনায় ফিরেন, খলিফা আল কাদির বিল্লাহর কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠান যেন তাকে খোরাসান ও অন্যান্য এলাকার কর্তৃত্বের আনুষ্ঠানিক চুক্তি প্রদান করা হয় এবং তিনি তাতে সম্মত হন"। (আল- কামিল) গজনভীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য কোন আনুষ্ঠানিক চুক্তির প্রয়োজন ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন এক কুরায়শী খলিফার অধীনে থাকতে যাকে কেন্দ্র করে মুসলিমগণ জামায়াতবদ্ধ হবে।

খলিফা পরবর্তীতে তাকে অনেক উঁচু পদবী দিয়ে সম্মানিত করেন। ইবন আল জাওযী বলেন, "খলিফা তাকে এক চুক্তি প্রদান করেন এবং উল্লিখিত খেতাবে ভুষিত করেন: ইয়ামিন আদ দাওলাহ (রাষ্ট্রের ডান হাত), আমিন আল মিল্লাহ (দ্বীনের তত্ত্বাবধায়ক) এবং পরবর্তীতে নিজাম আদ দীন (দীনের হুকুম) এবং নাসির আল হাক্ব (সত্যের সমর্থক)।"

আল গজনভী কখনোই কুরায়শী খলিফার প্রতি আনুগত্যে বিরত ছিলেন না, তবে মিথ্যা ও ভণ্ড ফাতিমী বংশ ধর দাবিদারদের সর্বদা তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন। ইবনুল আছির বলেন, "তার সমগ্র এলাকায় খুতবায় খলিফা আল কাদির বিল্লাহর জন্য দুয়া করা হত। যখন ফাতিমিয়্যা (ওবায়দিয়্যাহ) তাকে তাদের দলে ভিড়ানোর জন্য অনেক বই ও উপঢৌকনসহ কতিপয় দূত প্রেরণ করে, তিনি সেগুলোসহ তাদের জালিয়ে দেন। (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ) আল গজনভী জনৈক দূতকে বন্দি রূপে খলিফার নিকট প্রেরণ করেন তার শাস্তি তদারকি করার জন্য। ইবনুল জাওযী বলেন, "মিশরীয় ওবায়দী নেতা কর্তৃক প্রেরিত এক দূতকে ইয়ামিন আদ দাওলাহ এক চিঠি মারফত খলিফা আবুল আব্বাস আল কাদির বিল্লাহর নিকট পাঠান। চিঠিতে তিনি এ কথা উল্লেখ করেন যে, তিনি খলিফার অনুগত, খিলাফার প্রতি আনুগত্য তিনি অপরিহার্য মনে করেন এবং যারা আব্বাসী খিলাফাকে অমান্য করে তিনি তাদের থেকে মুক্ত। পরবর্তী দিন কাপড়ের উপঢৌকনসমূহ নবী গেটে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে গর্ত খুঁড়ে লাকড়ি ও কাপড়ের উপঢৌকনসমূহ নিক্ষেপ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়"। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, "মিশরের ওবায়দী নেতা তার প্রতি আনুগত্য দাবি করে আল গজনভীর নিকট দূত মারফত বার্তা প্রেরণ করেন, ফলে তিনি সেই চিঠি ঐ দূতের মাথায় জালিয়ে দেন। সুলতান আহলুস সুন্নাহকে অসামান্য ভাবে সমর্থন করেন"। (মিনহাজ আস সুন্নাহ)

৩৯০ হিজরি সনের শেষের দিকে মুরতাদ কারামিয়্যাহ শাসনের অবসান কল্পে আল গজনভী মুলতানে অভিযান চালান। ইবনুল আছির বলেন, "এর শাসক আবুল ফুতুহের আক্বিদাহ›র সমস্যার কথা জানা ছিল, এমনকি সে নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। সে তার প্রজাদের তার আক্বিদাহ›র দিকে আহবান করে, যাতে তারা সাড়া দেয়। ইয়ামিন আদ দাওলাহ তাকে দমনের জন্য জিহাদের সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু তিনি পথে বেশ কিছু নদীর সন্ধান পান যেগুলো গভীর ও চওড়া, ফলে তিনি ওপাড়ে যেতে পারছিলেন না। তিনি এক ভারতীয় রাজার নিকট তার এলাকার ভিতর দিয়ে মুলতানে যাওয়ার অনুরোধ জানান কিন্তু রাজা তাতে অসম্মত হয়। ফলে তিনি মুলতানের পূর্বে ঐ রাজার দিকে অগ্রসর হন। তিনি বলেন, " আমরা দুই অভিযান এক সাথে পরিচালনা করব"। আল্লাহর রহমতে আল গজনভী ঐ রাজাকে পরাস্ত করে মুলতানে পৌছাতে সক্ষম হন।

ইবনুল আছির বলেন, "যখন আবুল ফুতুহ তার অভিযানের খবর পায়, সে জানতো যে, তাকে মোকাবিলা করতে পারবে না, তাই সে তার ধন সম্পদ শ্রীলঙ্কায় প্রেরণ করে মুলতান থেকে পলায়ন করে। ইয়ামিন আদ দাওলাহ মুলতানে পৌছে শিবির স্থাপন করেন। সেখানে লোকদের তাদের ভ্রান্তিতে অন্ধ দেখে তিনি তাদের ওপর অবরোধ আরোপ করেন, যতক্ষণ না পরিস্থিতি তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান যতক্ষণ পর্যন্ত না বলপূর্বক শহরের কর্তৃত্ব দখল করেন। তিনি লোকদেরকে বিদ্রোহের শাস্তি স্বরূপ ২০,০০০ দিনার অর্থদণ্ড দেন, অর্থাৎ তওবাহ ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থদণ্ড দেয়া হয়।

সুলতান মাহমুদ আল গজনভী কুরায়শী খলিফার প্রতি আনুগত্যে এবং মুবতাদিয়্যা আর যানাদিক্বাদের প্রতি বিরোধিতায় একনিষ্ঠ ছিলেন। ৪০৮ হিজরি সনে "ইয়ামিন আদ দাওলাহ, আমিন আল মিল্লাহ আবুল কাশিম মাহমুদ ইবন সুবুক্তিকিন, আমির উল মুমিনিন এর আদেশ অনুযায়ী এবং তার অনুসরণে, মুতাযিলা, রাফিদা, ইসমাইলিয়্যাহ, কারামিয়্যাহ, যাহিমিয়্যাহ, মুশাব্বিহাহদের কতককে কতল করেন আর কতক কে ক্রুশবিদ্ধ, কারগারে বন্দী আর নির্বাসিত করেন। তিনি তা করেন খোরাসান এবং অন্যত্র এলাকায় যেখানে তাকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তিনি আদেশ করেন যে, মিম্বর থেকে মুবতাদিয়্যাদের অভিসম্পাত করা হবে এবং আহলুল বিদআতের প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের জমিন থেকে বহিষ্কার করা হবে। এভাবে ইসলামের ইতিহাসে তিনি উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করেন। (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

৪২০ হিজরি সনে আল গজনভী রায়তে অভিযান চালান যেখানে রাফিদা "মাজদ আল দাওলাহ" আল বুয়াইহী শাসন করত। তিনি তাকে ও তার সৈন্যদের সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করে তার শাসনের বিলুপ্তি ঘটান। তিনি খলিফা আল কাদির বিল্লাহর কাছে চিঠি মারফত এই খবর দিয়ে পাঠান, ইবনুল জাওযী যা এভাবে বর্ণনা করেন, "আল্লাহ এই জমিন থেকে অন্ধকারের থাবা দূর করেছেন এবং কাফির বাতিনিয়্যাহ আর ফাসিক মুবতাদিয়্যাহদের ভ্রান্ত দাওয়াহ থেকে পবিত্র করেছেন। জাঁহাপনাকে প্রকৃত অবস্থা এবং কুফর ও বিদআতের লোকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তার অনুগত খাদেমের সংগ্রাম ও লড়াইয়ের প্রচেষ্টার বিষয়ে তাকে অবহিত করেন- খোরাসানের জমিনে অশুভ বাতিনি সম্প্রদায়ের উত্থান, বিশেষ করে রায়তে তাদের মূল আস্তানা থেকে প্রকাশ্যে কুফরের দিকে দাওয়াহ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তিনি সমন্বিত দমনাভিযান চালান। সেখানে মুতাযিলি মুবতাদিয়্যাগণ চরমপনহী রাফিদী সম্প্রদায়ের সাথে একত্র হয়, যারা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধিতা করে, প্রকাশ্যে সাহাবাদের অপমান করে, কুফর আক্বিদাহ ধারণ করে এবং হারামকে হালাল রূপে গণ্য করে"।

অনুরূপভাবে, সুলতানের সাথে বিভ্রান্ত আশারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের লড়াই হয়, যে সম্পর্কে আয যাহাবী বলেন, "ইবন ফুরাক (জনৈক আশারী আলিম) সুলতানের কাছে গিয়ে বলে, এটা বৈধ নয় যে আল্লাহ উপরে আছেন বলা, কারণ সেক্ষেত্রে তিনি নিচে আছেন বলতে হবে, যেহেতু যে উপরে আছে সে নিচেও থাকে। জবাবে সুলতান বলেন, আমি তার বর্ণনা দেই নি আর এটা আমার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নয়। তিনি সেরূপ যেরূপ তিনি নিজের বর্ণনা দিয়েছেন (উপরে আছেন)। ফলে ইবন ফুরুক বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে"।(ইবন সিয়ার)

আয যাহাবী আরও বলেন, "আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান আল বাজি বলেন, খোরাসানের নেতা মাহমুদ ইবন সুবুক্তিকিনের কাছে কারামিয়্যাহরা এই সংবাদ পাঠায়, যখন ইবন ফুরাক কারামিয়্যাহদের ব্যাপারে শাস্তি দাবি করে, "সে এমন এক ব্যক্তি যে আমাদের বিরক্তির উদ্রেক করেছে এবং আপনার মতানুযায়ী কুফর ও বিদআতে সে আমাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাকে মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মুত্তালিবের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন, তিনি আজকে তাঁকে আল্লাহর রাসুল মানেন কিনা? এ কথা তাকে ভীষণ নাড়া দেয়। তিনি বলেন, যদি তা সত্য হয়, আমি তাকে কতল করব। পরে তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসুল ছিলেন, তবে বর্তমানের জন্য নয়। ফলে তিনি তাকে কতলের নির্দেশ দেন। অন্যরা সুপারিশ করে বলে যে তিনি বৃদ্ধ। তখন তাকে বিষ পানে হত্যা করা হয়"। (তারিখ আল ইসলাম)

ইবন হাযম বলেন, "এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে যারা আশআরীদের মতানুযায়ী দাবি করে যে, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মুত্তালিব বর্তমানে জীবিত নয়। সুলায়মান ইবন খালাফ আল বাজি- যিনি বর্তমান নেতাদের একজন – আমাকে বলেন যে, মুহাম্মাদ ইবন আল হাসান ইবন ফুরাক আল আসবাহানি কে খোরাসানের নেতা মাহমুদ ইবন সুবুক্তিকিনের নির্দেশনা অনুযায়ী বিষ প্রয়োগে

হত্যা করা হয়েছিল… আমরা আল্লাহর কাছে এরূপ মত থেকে পানাহ চাই যা সন্দেহাতীতভাবে ভয়ঙ্কর কুফর। যারা তা বলে তারা কুরআন কে অস্বীকার করে, যেহেতু আল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর রাসুল। (সুরা ফাতিরঃ২৯) তারা আযান ও ইকামতকে অস্বীকার করে, যা দিনে ও রাতে পাঁচবার সকল মুসলিমের ওপর ফরয করা হয়েছে। তারা কুফফারদের প্রতি সকল মুসলিমের দাওয়াহকে অস্বীকার করে, যা ব্যতীত জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না এবং যে ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত। তারা সাহাবা থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রজন্মের ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকল মুসলিমদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যারা সকলে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল প্রকাশ্যে ঘোষণার ক্ষেত্রে ঐকমত পোষণ করেছেন। এই অভিশপ্ত মতানুযায়ী, প্রত্যেক আযানের আহ্বানকারী, ইকামাতের ঘোষণাকারী এবং ইসলামের দায়ী যারা বলে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল, তারা মিথ্যুক- বরং তাদের বলতে হবে যে, মুহাম্মাদ ছিলেন আল্লাহর রাসুল। এই কারণে আমিরুল মুমিনিনের খাদেম, খোরাসানের নেতা আমির মাহমুদ ইবন সুবুক্তিকিন আশআরীদের নেতা ইবন ফুরাক কে হত্যা করেন। আল্লাহ এজন্য মাহমুদকে উত্তম সওয়াব দিন এবং ইবন ফুরাক, তার সমর্থক ও অনুসারীদের অভিসম্পাত করুন"। (আল ফিসাল) সুতরাং, আল গজনভী কালামের অনুসারী আর ভ্রান্তির দিকে আহ্বানকারীদের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতেন না।

ইবন তাইমিয়্যাহ সুলতানের প্রশংসা করে বলেন, "সুলতানের রাজত্ব ছিল এই যুগের অন্যতম সেরা রাজত্ব। ইসলাম এবং সুন্নাহর কদর ছিল তখন। প্রকৃতই তিনি ভারতের মুশরিকদের ওপর চড়াও হতেন এবং এর দরুন অভূতপূর্ব ন্যায়বিচারের বিস্তার ঘটান। এভাবে তার সময়ে সুন্নাহ ছিল প্রকাশ্য আর বিদআত ছিল কোণঠাসা" (আল ফাতওয়া) তিনি আরও বলেন,"তিনি ছিলেন অন্যতম সেরা ও ন্যায়পরায়ণ রাজা এবং বিদআতের অনুসারীদের প্রতি অন্যতম কঠোর শাসক"। (মিনহাজ আস সুন্নাহ)

ইমামের প্রতি বাইয়াহ প্রদান এবং মুবতাদিয়্যা ও যানাদিক্বাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সুফল হচ্ছে: সমর্থন, দৃঢ়তা অর্জন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ। ইবন কাছির ৪২১ হিজরি সনে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে বলেন, "এই বছর রবিউল আউয়াল মাসে ন্যায়পরায়ণ রাজা, মহান বীর যুদ্ধনেতা, ক্ষমতাবান মুরাবিত, বিজয়ী মুজাহিদ, ইয়ামিন আদ দাওলাহ আবুল কাশিম মাহমুদ ইবন সুবুক্তিকিন ওফাত লাভ করেন। তিনি ছিলেন খোরাসান এবং তৎসংলগ্ন বৃহত্তর অঞ্চলের নেতা, ভারতের অধিকাংশ এলাকার বিজয়ী, তাদের মূর্তি ও মন্দির ধ্বংসকারী, ভারতীয়দের এবং তাদের নেতাদের দমনকারী"।

এগুলো ছিল ন্যায়পরায়ণ সুলতানের ঘটনাবহুল জীবনের ওপর সামান্য আলোকপাত। তিনি তৌহীদ ও সুন্নাহকে সাহায্য করেন, শিরক ও বিদআত উচ্ছেদ করেন এবং এমন সময়ে তিনি মুসলিম জামায়াতের সংহতি স্থাপনে সচেষ্ট হন, যখন অসংখ্য বিদআতি ও বিভ্রান্ত দলের উদ্ভব ঘটে, যারা খিলাফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে একে দুর্বল করতে চেয়েছিল। আমিরুল মুমিনিন আল কাদিরের প্রতি সুলতান মাহমুদের আনুগত্য ঐ দলসমূহকে রোধে এবং কুরায়শী খিলাফার গৌরব ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান খোরাসানে নতুন প্রজন্মের মুওয়াহিদিন, যাদের দিয়ে আল্লাহ ইসলাম ও এর অনুসারীদের সাহায্য করেন, তারা শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বিদআতের দমন এবং জামায়াত আঁকড়ে ধরে থাকার ক্ষেত্রে তৎপর। আল্লাহর নিকট কামনা করি, ভারত এবং সিন্ধ যেন তাদের হাতে পুনরায় বিজিত হয়। তিনি অবশ্যই তা করতে সক্ষম এবং সকল প্রশংসা তারই যিনি এই বিশ্ব জাহানের রব।